International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2014, Vol 1, No.6, 168-180. 168

Available online at http://www.ijims.com

ISSN: 2348 – 0343

Pre-Kallol and Kallol Patrika : Tendency of the Authors to be Independent

f¡L-কল্লোল পত্রিকা J কল্লোল পত্রিকা : লেখকদের স্বতন্ত্র হওয়ার প্রবণতা

Dr Apurba Chatterjee (Late)

Ex- Assistant Teacher, Sitapur School, Bolpur, Birbhum

Dr. Chhanda Chatterjee (Eds) and Dr. Amiya Chatterjee (Eds)
Department of Philosophy, Balurghat College, West Bengal, India.

Abstract

In Bengali literature Kallol group played an influential role in literary movement. The writers of Kallol group brought a new era in modern literature. There are so many young writers like Manindralal Basu, Gakul Chandra Nag, Sailajananda, Premendra Mitra, Yubanaswa who had contributed their writings in Kallol. Kallol group was the first conscious literary movement to embrace modernism in Bengali literature. The members of Kallol group heavily influenced by Sigmund Freud, and as a result sexual consciousness was found in their writings. Moreover the effects of post world war like poverty, frustration etc, was also reflected in the writings of the authors of Kallol. Even so many narrating story from English, French, Russian was published in kallol. Dr. Apurba Chatterjee has analysed all these issues critically in this paper. Dr. Chatterjee completed his Master Degree from Visva-Bharati University,India. He has done his research work in Bengali Department under the supervision of Prof. Bhabotosh Dutta.

Key Words: Kallol, Freud, Literary Movement, World war

Preface

যে কোন মৌলিক গবেষণাপত্র একজন গবেষকের দীর্ঘ অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার বিনিময়ে উদঘাটিত নতুনতর জ্ঞান ও বোধের জগৎ। সেই জ্ঞান এবং গবেষকের উপলব্ধ সত্য কেবল গবেষণাপত্রের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যখন বৃহত্তর পাঠকসমাজের জন্য প্রকাশিত হয়, তখন তা থেকে বৌদ্ধিক চর্চার আরো নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হওয়া সম্ভব। নতুন গবেষণার সম্ভাবনাকে উসকে দেওয়াতেই গবেষণাপত্রের সার্থকতা, যা ঘটতে পারে সেই গবেষণাপত্রটি প্রকাশের মাধ্যমে। ডঃ অপূর্ব চ্যাটাজ্জীর গবেষণাfœ ***কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত Efe£p J Nòf: thouhÙ J tnÒf¢Ÿal pj£r¡***-এর এক একটি অধ্যায় ক্রমান্বয়ে আমরা প্রকাশের উদ্যোগ

নিয়েছি। এটির প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের একটি স্বল্পালোকিত স্থানকে অধিকতর উজ্জ্বল করে তুলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মধ্যে দিয়ে। আমাদের অগ্রজ ডঃ অপূর্ব চ্যাটার্জ্জী ইহ জগতের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন করলেও তিনি হয়তো আরো অনেকদিন বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টি কর্মের মধ্যে। প্রতিটি সৃষ্টি কর্মের ক্ষেত্রে কর্মকর্তার আত্মতৃপ্তিই তো শুধু থাকে না, সেই কর্মের ফল যখন মানুষের কাছে পৌছায় তখনই কর্মের সার্থক রূপায়ন quz ¢L p¡¢qaÉ, ¢L ¢n〉fLm¡, ¢L cne-- সমস্ত ক্ষেত্রেই গবেষণাধর্মী gpm R¡œ-ছাত্রী, গবেষক কিংবা সাধারন মানুষের প্রয়োজনে যদি না লাগে তবে সেই গবেষণার মূল্য কোথায়? তবে সব গবেষণাধর্মী ফসলই যে পৃথিবীর আলো পায় এমনটা নয়। অনেক কিছুই অন্ধকারে হারিয়ে যায় এবং যার স্বাদ অন্যের কাছে অনাস্বাদিত থেকে যায়।

ডঃ অপূর্ব চ্যাটার্জ্জী বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল পত্রিকা'য় প্রকাশিত উপন্যাস ও গল্প নিয়ে গবেষণাধর্মী যে কাজ করেছেন, তা অন্য সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়ভার কিছুটা হলেও আমাদের আছে। আর অন্যের কাছে গবেষণার ফল না পৌছালে তার মূল্যায়নই বা হবে কিভাবে। এই কারণে তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর গবেষণাপত্র পান্ডুলিপিগুলি প্রকাশ করার আগ্রহ জন্মাতে শুরু করে।

যে কোন মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশনা (*posthumous publication*)Hl ক্ষেত্রে যেহেতু অনেক আবেগ জড়িয়ে থাকে, সেইকারণে এই ধরণের প্রকাশের সময় কতকগুলি শঙ্কা মনের মধ্যে থাকেই যায়-- f¡ä¢m¢fl pÇf¡ce¡ kb¡যথ হলো কিনা, প্রকাশিত বিষয় কতসংখ্যক পাঠকের কাছে পৌছচ্ছে, বিষয়ের মূল্যায়ন যথাযথভাবে হবে কিনা ইত্যাদি। তাছাড়াও এই ধরণের প্রকাশের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে পান্ডুলিপি সম্পাদনা করা খুব সহজ হয় না। বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী প্রনব কুমার ভ–¡Q¡র্য মহাশয়ের কাছে এব্যাপারে আমরা কৃতজ্ঞ কারণ তার আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণাপত্রটির প্রকাশ সম্ভব হতো e¡z

Editors

Article

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় 'কল্লোলে'র কথাসাহিত্যিকদের দান আজ সর্বজন স্বীকৃত। 'কল্লোল গোষ্ঠী'র[1] লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিয়ে এসেছিলেন এক নতুন যুগ। অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই 'নতুনত্ব' নতুন নয়। বারে বারেই যখন প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধের প্রতি সংশয় দেখা দিয়েছে, তখন এই 'নতুনের' আবির্ভাব হয়েছে। তাই বলা যায়, Every age, it has been said, is an age of transition. h¡wm¡ Lb¡-সাহিত্যের পূর্বাপর ধারা লক্ষ্য করলে এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্যায়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, আর রবীন্দ্র সমকালেই আবির্ভাব হয়েছে শরৎচন্দ্রের, 'ভারতী গোষ্ঠী'র। আর তার পরেই 'কল্লোল গোষ্ঠী'। প্রথাগত আদর্শকে ত্যাগ করে 'কল্লোলে'র লেখকেরা নিয়ে এলেন বাংলা সাহিত্যে এক 'নতুন kN'z HC "eaea' c¢øi¢‰l -- যা এর আগে ছিল না। জীবনকে এঁরা Hje এক দৃষ্টিকোন থেকে দেখেছেন, এমনভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন........যা প্রাককল্লোল বাংলা সাহিত্যে ছিল না। এবার আর বঙ্কিম উপন্যাসের মত l¡S¡-জমিদারের কাহিনী নয়, রবীন্দ্র উপন্যাসের মত নাগরিক উচ্চবিত্ত মানুষের কথা নয়, বিষয়বস্ত নয় nlvQ¾c hi 'ভারতী গোষ্ঠী'র কথা-সাহিত্যিকদের মত, প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই ধারার টানা-পোড়েনের। এবারের কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তর মধ্যে একদিকে যেমন এসেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের হতাশা, সংশয়,

ব্যর্থতা, তেমনি এসেছে রোম্যান্টিক প্রেম, ফ্রয়েডিয় যৌন চেতনা, উপস্থিত হয়েছে বস্তিজীবন, সমাজের "Ah'¡a', "AfS¡a' j¡eo, N¡j£Z L¢m-মজুর, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপন সংগ্রাম। সমাজের অনেক অপরিচিত, অনালোকিত বিষয়ের উপর এঁরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ‘কল্লোলে’র আগে একমাত্র ‘ভারতী গোষ্ঠী’র কথাসাহিত্যিকদের কারও কারও মধ্যে এর আভাস লক্ষ্য Ll¡ k¡uz

একথাও ঠিক যে হঠাৎ করে ‘নতুন’ কিছুর সৃষ্টি হতে পারেনা, তা সম্ভবও নয়। ‘কল্লোলে’র কথাসাহিত্যিকগণ যে প্রাক্-কল্লোল কথাসাহিত্যিকদের থেকে পৃথক হলেন, তা আকস্মিক নয়, এর পিছনেও কারণ আছে। তা হল একদিকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক পটভূমি, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা। ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’(১৭৯৩) বাংলা দেশে অনেক প্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি করেছিল। এই মধ্যস্বত্বভোগীর অনেকেই বাঙালি উচ্চবিত্ত সমাজ থেকে উঠে এসেছিল। এই সময় বাঙালি ছিল বেশ স্বচ্ছল, কারণ এর ফলে ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধা ভোগ করতে পেরেছিল। কিন্তু এই আর্থিক স্বচ্ছলতা বেশী দিন রইল না। এl jm কারণও ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা। নানান কারণে জমির লাভজনকতা কমতে লাগল। সৃষ্টি হল মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে-- ""jd¢hš cC fL¡l : (1) জমিবিহীন অর্থাৎ কোন প্রকার ছোটখাট চাকুরী বা মধ্যবিত্তজীবী এবং (২) কিঞ্চিৎ জমিজমা আছে এমন তরো। বাঙালী মধ্যবিত্ত এমনকি ঊনবিংশ শতকেও জমিবিহীন ছিল e¡z ---বিংশতি শতকের বাঙালী মধ্যবিত্ত বিশেষ করেই জমিজমাবিহীন।’’[2] জমির মায়া ত্যাগ করে গ্রাম ছাড়া চাকরির আশায় এই মধ্যবিত্তের একাংশ শহরে চলে আসতে লাগল। যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে গেল। ইংরেজের দৌলতে স্কু্ল-কলেজের সংখ্যা বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা। আবার আর্থিক সংকট তীব্র হওয়ার ফলে মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া সম্ভব হল না, তারাও শিক্ষিত হয়ে চাকরির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল। মধ্যযুগীয় সংস্কার ভেঙে এল Ù£-পুরুষ উভয়েরই প্রতিযোগিতার সময়। অথচ শিক্ষিত বেকারের তুলনায় চাকরির আসন সীমিত। চারিদিকে দেখা দিল শিক্ষিত মানুষের হাহাকার। এ এক বিচিত্র কাল।

একদিকে যখন এই তীব্র আর্থিক সংকট, সামাজিক পটপরিবর্তন, তারই পাশাপাশি সমগ্র ভারতবর্ষে তখন চলছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। বাংলাদেশও এই রাজনৈতিক দোলাচলতা থেকে অব্যহতি পায় নি। পরাধীনতার গ্লানি তখন সমগ্র বাংলাদেশে এক দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। একটার পর একটা রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যদিয়ে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল আমূল। ১৯০৫ সালে এল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। লর্ড কার্জনের অশুভ বঙ্গ বিভাগ রোধ করতে দেশের মানুষ আন্দোলনে নামল। এরই মধ্যে ১৯০৮ সালে মজঃফ্lfl হত্যাকান্ড, মানিকতলার বোমার মামলা। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ হল। বাঙালির মন তখন পরাধীনতার বন্ধন মুক্তিতে উদগ্রীব। এই সময় শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪)। গান্ধীজী ভেবেছিলেন যুদ্ধের সময় ইংরেজকে সাহায্য করলে স্বাধীনতা মিলবে। তাই তিনি দেশীয় সৈন্য নিয়ে ইংরেজের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে স্বাধীনতার পরিবর্তে পাওয়া গেল ‘মন্টেগু-চেমস্বফোর্ড সংস্কার’ (১৯১৯)। এর দ্বারা দেশীয় l¡S£-গুলিকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হলেও অর্থনৈতিক চাপ পড়ল বাংলাদেশের উপর। একদিকে মন্দা অর্থনীতি, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা-- এই দুইয়ের টানা-পোড়েনে বাংলাদেশ যখন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন তখন N¡å£S£ X¡L দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১)। অসহযোগ আন্দোলনে দেশের সর্বস্তরের মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। শহরের শিক্ষিত মানুষ গিয়েছিল গ্রামে, গ্রামের মানুষকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে। তারা দেখল গ্রামের প্রকৃত অবস্থা। কিন্তু জাতীয় জীবনে অন্ধকার নেমে এল চৌরি-চোরার হিংসাত্মক ঘটনার পর। N¡ন্ধীজী আন্দোলনের যে পথ দেখালেন দেশের মানুষ তার মধ্য দিয়ে ‘স্বরাজ’ আনার স্বপ্ন দেখেছিল। তাই

আবার গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু হল আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০)। কঠিন দুঃখ বরণ ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে একদিন সেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়া তখন দূর-অস্ত। এই ভাবে বারবার üাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েও যখন স্বাধীনতা পাওয়া গেল না বরং কেবলই নেতিবাদী সুর শোনা যেতে লাগল, তখন আর মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্খা বলে কিছু রইল না। কোনো কিছুর প্রতি আস্থা রাখাই কঠিন হয়ে fsmz[3]

কল্লোল পত্রিকার প্রকাশ ১৩৩০ (১৯২৩)। এই পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন তাঁদের অনেকের বয়স তখন পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে।[4] কৈশোর ও যৌবনে মানুষের মনে থাকে রোম্যান্টিক স্বপ্ন, অনেক আশা। 'কল্লোলে'র লেখকেরা বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতাময় বাংলাদেশকে দেখেছিলেন। ভাবপ্রবণ এই সব বাঙালির মনে একদিকে হতাশা-ব্যর্থতা, অন্যদিকে যৌবনের রোম্যাি¼VL üf-- HC Bf¡a বিরোধী মানসিকতা এসেছে। 'কল্লোলে'র কথাসাহিত্যিকদের গল্পে-উপন্যাসে এই বিষয়বস্তুই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই জাগতে পারে যে প্রাক-কল্লোল লেখকেরাও তো এই দেশ কালের পটভুমিতে তো এই দেশ-কালের পটভূমিতে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের গল্প-উপন্যাসে এই যুদ্ধোত্তর সংকট তেমন ভাবে আসে নি কেন ? এর উত্তরে বলা যায়, এই সমস্ত পত্রিকার লেখকেরা ছিলেন প্রাচীন মূল্যবোধের প্রতি গভীরভাবে আস্থাবান। একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-- ঔপনিষদিক ঋষির দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে দেখেছেন, বিচার করেছেন, এই রবীন্দ্র ভাবমন্ডলেই অনেক লেখক লিখতেন, আর অন্যদিকে ¢Rm f¡Q£e pj¡S-সংস্কারের প্রতি আস্থা। তবে এদেঁর মধ্যে কেউ কেউ আধুনিক সংকটকে তাঁদের কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু পুরোনো মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করে নয়। পুরোনো সংস্কার ও মূল্যবোধের উপর আস্থা রেখেই দেশ-L¡লের পটভূমিতে মানুষকে বিচার করেছেন। তুলনায় কল্লোলের লেখকেরা পুরানো সব কিছুকে ত্যাগ করে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। কোনো লেখকই নিজের দেশ-কালকে অস্বীকার করতে পারেন না। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো ঋষিতূল্য ব্যক্তিও দেশ-কালের অমোঘ প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে বলেছিলেন ''লেখকের কাল, লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করে''[5]। বাহ্যিক জগতের যে টানা-পোড়েন বিশ শতকের প্রথম থেকে শুরু হয়েছিল, সাহিত্য ক্ষেত্রে যার চুড়ান্ত প্রকাশ কল্লোল পত্রিকার মধ্যে, সেই পত্রিকার কথাসাহিত্যের মধ্যেই, চরমভাবে দেখা গেল এই সংকটপূর্ণ দেশ-কালের চিত্র। প্রচলিত সংস্কারের প্রতি একরকম ঘৃণা, ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তায় অবিশ্বাস, সবকিছুকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যাচাই করে নেবার প্রবণতা দেখা গেল এঁদের মধ্যে। সমালোচকের মতে ''অতীত জীবনবাদের নিশ্চন্ত নির্ভর ও সুবলয়িত সম্পূর্ণতা বাস্তবে অপ্রাপনীয় বলিয়াই সাহিত্যে দুর্লভ। সাহিত্য-বিপণিতে এখন আর Ipe¡I¦¢Qকর রসে নিমজ্জিত মিষ্টান্ন মিলিবে না, সেখানে তেলে-i¡S¡, mhe¡š² T¡m-Q¡e¡Q¡I-S¡a£u M¡h¡I তৈয়ারি আছে। পাঠক যদি পূর্বের ন্যায় সাহিত্যিকের নিকট মধুর ও শান্ত রসের প্রত্যাশা করে, তবে এই প্রত্যাশা পূর্ণ হইবার নহে।''[6] 'কল্লোলে'র লেখকেরা তাই সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন একদিকে রোম্যান্টিকতা, যেমন মনীন্দ্রলাল বসুর 'সব পেয়েছির দেশ', অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা-- গোকুল চন্দ্র নাগের 'পথিক', আবার দেহকেন্দ্রিক প্রেম-চেতনা-- বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় বস্ত্তকে। অচিন্ত্যকুমারের Lb¡u-- ''কল্লোলের সে যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহস রোম্যান্টিকসিজমের মোহ মাখানো।''[7]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা, ঘটনা প্রবাহ বাংলা দেশের জনমানসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করল। প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রুশ বিল্পব (১৯১৭)। রুশ-িh®fh h¡P¡¢ml ¢Q¿¹¡-i¡he¡u Bjm f¢lhae নিয়ে এল। শিক্ষিত বাঙালি দেখল যে রুশ-িh®fh l¡¢nu¡l Bb-p¡j¡জিক পটভূমিতে কি পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মার্ক্সীয় দর্শন বাঙালির মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করল। সমকালীন এক লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''যুরোপের যুবক মনে যুদ্ধের প্রভাব যতটা, ততটা প্রভাবই রুশিয়ান বিল্পবের আমাদের দলের মনের ওপর। তার বেশী বললে অত্যুক্তি হয় না।''[8] এই 'দল' অর্থে সমকালীন শিক্ষিত সমাজ। 'কল্লোলে'র শিক্ষিত তরুণ লেখকদের মনে রুশ বিল্পব গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল। 'কল্লোলে'র লেখকেরা রুশ-সাহিত্য পড়েছিলেন, l¦n-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহও ছিল যথেষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 'কল্লোলে'র পৃষ্টাতেই রুশ সাহিত্য নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে -- এর মধ্যে নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চ—োপাধ্যায়ের 'রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙ্গালী' উল্লেখযোগ্য। রুশ বিল্পবের প্রভাবের ফলে সাহিত্যের বিষয়বস্তুর কিছুটা পরিবর্তন ঘটল। এতদিন যে অভিজাত সমাজ সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল, এখন তা আর রইল না। সাহিত্যে এবার এল গণচেতনা-- সমাজের 'নিচুতলার' মানুষই হল এই পর্বের কথাসাহিত্যের প্রধান উপকরণ। মার্ক্সীয় চিন্তা-ভাবনার ফলে 'কল্লোলে'র Lb¡-সাহিত্যিকদের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা গেল যা প্রাক্-কল্লোল বাংলা পত্রিকায় তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। 'কল্লোলে'র প্রকাশিত অনেক গল্পে সমাজের এই 'অবজ্ঞাত' মানুষের প্রধ্যান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে কাঁদে মোর বন্দী ভগবান', শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি', যুবনাশ্বের 'পটল ডাঙার পাঁচালী' প্রভৃতি গল্পগুলিতে লেখকেরা সমাজের অনালোকিত বিষয়বস্ত্ত উপর দৃষ্টি দিয়েছেন।

কিন্তু মার্ক্সীয় প্রভাব ততটা নয়, যতটা এঁদের মনে দাগ কেটেছিল ফ্রয়েডিয় চিন্তাভাবনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রয়েডিয় মনোবিকলন তত্ত্ব ইউরোপের জনমানসে প্রভাব ফেলেছিল। ফ্রয়েডের '*The Interpretation of Dreams*' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রী.। বাঙালি যুবসমাজের মধ্যেও ফ্রয়েডের এই বই প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও এই সময় ফ্রয়েডের আরও একাধিক গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ হয়েছিল। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মনে করেন মানুষের যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মূল কাজ করে যৌনচেতনা এবং তার অবস্থান মানুষের অবচেতন মনে। ''ফ্রয়েড ও তাঁর অনুসারীদের মতে মানুষের অবচেতনাই মানব মনের নিয়ামক, আর সেই অবচেতনার ক্ষেত্রটি হল এক চরম বিশৃঙ্খলার ও অরাজকতার লীলাভূমি।''[9] এই অবচেতনার মূল উৎস হল Sex বা যৌননাe i¡az f¡L-কল্লোল পর্বে নর-নারীর যে প্রেম ছিল রোম্যান্টিক, কখনো বা তা দেহকেন্দ্রিক হলেও শেষ পর্যন্ত দেহাতীত, কল্লোল পর্বে তা আর রইল না। দেহকেন্দ্রিক কামনা-h¡pe¡, el-নারীর যৌন সম্পর্ক, মানুষের আদিম প্রবৃত্তি-- এই সবই এঁদের সাহিত্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করল। কোনো কোনো লেখকের রচনায় এই 'শারীরিক তৃষ্ণার' জয়জয়াকার। ''সেই তৃষ্ণার টানে কামাতুর শব্দের যেমন আয়োজন ঘটেছে তেমনি নারীর কামপীঠ গুলির বর্ণনাও তীব্র-তপ্ত হয়ে উঠেছে।''[10] এই সব লেখকেরা প্রেমকে সমগ্র দেহের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার তাই লেখেন

''বিশ্বের অমৃত-রস যে আনন্দ করিয়া মন্থন,
লভিয়াছে নারী তার সুখোদ্বেল তপ্ত পূর্ণ স্তন,
m¡hZÉ-ললিত তনু যৌবন-পুষ্পিত পূত অঙ্গের মন্দিরে,
রচিয়াছে যে আনন্দ কামনার সমুদ্রের তীরে
সংসার শিয়রে ; --
যে আনন্দ আন্দোলিত সুগন্ধ নন্দিত স্নিগ্ধ চুম্বন-ao·¡u,

রক্তিম গ্রীবার ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জঙ্ঘায়,
লীলায়িত কটিতটে ও কটু ভ্রুকুটি তে,
ÇÇf¡-অঙ্গুলিতে ; --
fl¦o-পীড়ন তলে যে আনন্দে কম্প্র মুহ্যমান,
গাব সেই আনন্দের গান।''
-- 'গাব আজ আনন্দের গান'

বুদ্ধদেব বসুও কামনা-বাসনা কে স্বাগত জানিয়ে, অচিন্ত্যকুমারের মতোই বলেন --

''প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছো আমায় --
¢ejj ¢ej।তা মম ! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার !
....
বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-Efh¡p£ n‰¡l-L¡je¡
ljZ£-ljZ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি ;
তাদের মেটাতে হয় বাঞ্ছনার দুর্দম বিক্ষোiz''
--"h¾c£l h¾ce¡'

Lb¡-সাহিত্যে দেখা গেছে এই যৌনচেতনার আধিক্য। বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পঞ্চশর', অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে', শৈলজানন্দের 'মা' প্রভৃতি গল্পে-উপন্যাসে এই দেহকেন্দ্রিক কামনা বাসনা লক্ষ্য করা যায়। 'রজনী হল উতলা' গল্পের এক জায়গায় বর্ণনা-- ''তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কি কতগুলো খসখসে জিনিস এসে পড়ল--তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ রিসরিস করে উঠল। প্রজাপতির ডানার মতো কোমল দুটি গাল, গোলাপের পাপড়ির মতো দু'টি ঠোঁঠ, চিবকুটি কি কমনীয় হ'য়ে নেমে এসেছে, চারুভঙ্গী কি মনোরম, অশোকগুচ্ছের মত নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দু'টি বক্ষ-- কি সে উত্তেজনা, কি সর্বনাশা সেই সুখ, তা তুমি বুঝবে না, নীলিমা।''

'কল্লোলে'র লেখকেরা যৌনচেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কেউ কেউ একেই শেষ বলে মনে করেননি। সেই দেহগত ভাবনা কারো কারো লেখায় দেহ দর্শনেরও রূপ নিয়েছে, যেমন মোহিতলালের কবিতা। মোহিতলাল কামনাকে স্বীকার করেছেন, তার আমোঘ শক্তির কথা বলেছেন--'সৃষ্টির মূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার,' কিন্ত তবু কামনার কদর্য রূপটাকে দেখেননি, এর মধ্যেও সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন-

''চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে--
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি'',
Ae¿ lqpÉju£ üfpM£ ¢Ql-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন,-- এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী !
নেত্র তার মৃত্যু-e£m !-অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ ! কটি তলে জন্ম রাজধানী !
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-Evp !-S¡¢e a¡q¡ S¡¢ez''
--"f¡¿'

সমালোচক ঠিকই বলেছেন-- ''মোহিতলালের এই বলিষ্ঠ দেহবাদের রিয়ালিজম কল্লোলীয় সাধনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।''[11]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা দেশে তরুণ 'কল্লোল গোষ্ঠী'র কথা সাহিত্যে, দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তার পিছনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের । তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগ এই প্রথম নয়। উনিশ শতকে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রূপ-l¡al সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের যোগ সর্বজনবিদিত। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনীর'র সঙ্গে স্কটের 'আইভান হো'র মিলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্কিম উপন্যাসের আঙ্গিক যে পাশ্চাত্য সাহিত্যে থেকে নেওয়া, তা একালের বিশিষ্ট সমালোচক প্রমাণ করেছেন।[12] বঙ্কিমের পর রবীন্দ্র কথা-সাহিত্যের বিশেষ করে তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্প গুলির সঙ্গে অনেক প্রতীচ্য গল্পের মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে 'ভারতী গোষ্ঠীর' কথা সাহিত্যিকদের সঙ্গেই f¡ÕQ¡aÉ Lb¡-সাহিত্যের যোগ ছিল প্রাক-কল্লোল পর্বে সর্বাধিক। কল্লোল পত্রিকার কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে এই যোগ দেখা দিল আরও ব্যাপক ভাবে। তবে কখনো তা পরোক্ষভাবে, কখনো বা প্রত্যক্ষভাবে। শুধুমাত্র ইংরাজী সাহিত্যই নয়, রুশ, কন্টিনেন্টাল স্ক্যান্ডেনেি u, gl¡p£-- প্রভৃতি সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের পরিচয় হল গভীর। এর মূল কারণ এই সব প্রতীচ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এঁদের মানসিকতার সাযুজ্য। এই প্রসঙ্গে সমকালীন সজনীকান্ত দাস লিখেছেন ''নরওয়েজিয়ান, স্ক্যান্ডানেভিয়ান, আইসল্যান্ডিক, ভেনিশ পোলিশ ভাষার বহু গল্প উপন্যাস তখন ইংরাজী অনুবাদে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি একে একে সেগুলি গলাধ:করণ করিয়া যাইতেছি। ইহার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও রুশীয় ভাষায় বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা যে ছিল তাহা বলাই h¡ýmÉz''[13]

সজনীকান্ত 'কল্লোলে'র লেখক ছিলেন না, বরং 'কল্লোল' বিরোধীই ছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর বক্তব্য থেকে HLb¡ fj¡Z হয় যে সমকালীন 'কল্লোলে'র লেখকদের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের গভীর যোগ ছিল। 'কল্লোলে'র লেখকেরা গভীর মনযোগ সহকারে পাশ্চাত্য সাহিত্য পড়েছিলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ, অনুকরণ করেছিলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছিলেন। 'কল্লোলে'র অন্যতম লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন্তব্য থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়-- ''জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি, তাতে দোষ কি ?'' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'কল্লোলে'র লেখকদের অনেকেরই বাংলাদেশের বাস্তব জীবন সম্পর্কে তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। এঁরা ছিলেন নাগরিক জীবনের fÐÖf£ । পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠ করে জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা তাঁদের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাকেই তাঁরা সাহিত্যে চিত্রিত করেছেন। তাই তো অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'মিথুন প্রবৃত্তি'র 'পৌন:পুণ'র অভিযোগ এনে বলেছিলেন,-- ''এ সম্বন্ধে উগ্রতা নরোয়ে প্রভৃতি দেশের সাহিত্য দেখেছি। দেখে আমি এই মনে করেই বিস্মিত হয়েছি যে আমাদের দেশের মানুষের এই ব্যাপারে এমনতর নিত্য লালসা নেই।''[14]

'কল্লোলে'র লেখকেরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যে রুশ সাহিত্য পড়েছিলেন সব থেকে বেশী। রুশ বিপ্লব, মার্কসীয় দর্শন, সাম্যবাদী চিন্তা ভাবনা তাঁদের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল। রুশ সাহিত্যের মধ্যে টলস্টয়, ডষ্টয়েভস্কি, স্টুর্গেনিভ, চেকভ, গোর্কি প্রভৃতি লেখকদের লেখার সঙ্গে এঁদের পরিচয় ছিল। এঁদের কারও কারও উপন্যাসে ওই সব লেখকদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রবোধ সান্যালের 'যাযাবর' উপন্যাসের সঙ্গে স্টুর্গেনিভের 'পিতা-পুত্র' উপন্যাসের মিল দূরনিরীক্ষ নয়। 'পিতা-fত্র' উপন্যাসের বাজারভ চরিত্রের মধ্যে যে

বোহেমিয়াণ জীবন, বেপরোয়া মনোভাব তা 'যাযাবরে'ও লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্য কুমার লিখেছেন-- ''কখনো উন্মত্ত, কখনো উন্মনা। কখনো সংগ্রাম কখনো বা জীবনতৃষ্ণা। প্রায় টুর্গেনিভের চরিত্র।''[15]

ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে 'কল্লোলে'র লেখকদের যে ঘনিষ্ট যোগ ছিল তার বড় প্রমাণ 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠাতেই রোঁমা-রোঁলার 'জাঁ কৃস্তফে'র বাংলা অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ (যদিও তা অসম্পূর্ণ)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠাতে একাধিক ফরাসী গল্পের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। এছাড়াও 'ফ্লবের বা জোলা যে যৌন বিদ্রোহ বা নীতি বিদ্রোহ কিংবা সমাজ-বিপ্লবী মূল্যবোধের প্রবক্তা আমাদের যুদ্ধোত্তর কালের ফ্রয়েডীয় যৌনচিন্তায় দীক্ষিত তরুণদের কাছে তার আবেদন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।''[16] স্ক্যান্ডেনেভিয় ও কন্টিনেন্টাল সাহিত্যিকদের মধ্যে নুট হ্যামসুন ও বোয়াবের উপন্যাসের প্রভাব 'কল্লোলে'র লেখকদের মধ্যে পড়েছিল। নুট qা্যামসুনের 'প্যান' উপন্যাসের অনুবাদ অচিন্ত্যকুমার 'মীনকেতন' নামে 'কল্লোলে' ধারাবাহিক ভাবে অনুবাদ করেন। 'প্যান' উপন্যাসের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসের মিল লক্ষ্য করা যায়। ড. সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন-- ''ইহার প্রথম মৌলিক গল্প 'বেদে' ও এই বিদেশী লেখকের প্রভাব চিহ্নিaz''[17] হ্যামসুনের "*Hunger*' উপন্যাসের সঙ্গে প্রবোধ সান্যালের 'যাযাবর' উপন্যাসের সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া তিনি বোয়ারের '*The Prisoner who song*' -এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন 'বন্দী বিহঙ্গ' নামে। শুধুমাত্র অনুবাদ বা অনুকরণই নয়, এই সব প্রতীচ্য লেখকদের কারও কারও সঙ্গে এঁদের ব্যাক্তিগত যোগাযোগও ছিল। অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে রোঁমা রোঁলাকে লেখা পত্র, তার উত্তরে রোঁলার লেখা ইংরাজী পত্র, বোয়ার ও নুট হ্যামসুনকে লেখা চিঠি , হ্যামসুনের স্ত্রীর লেখা তার উত্তর দেখা যায়।

যুদ্ধোত্তর সামাজিক অবস্থার অবক্ষয় ইংরাজী সাহিত্যে একটা নতুন বিষয় এসেছিল, তা qm-- চেতনা প্রবাহ। ইংরাজী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ভ্যর্জিনিয়া উলফ, জেমস জয়েস, হেনরি জেমস প্রভৃতি ঔপন্যাসিকগণ এই চেতনা প্রবাহকে উপন্যাসের মূল বিষয় হিসাবে নিয়ে এলেন। 'কল্লোলে'র লেখকদের কেউ কেউ এই চেতনা প্রবাহ কে প্রথম সচেতন ভাবে বাংলা উপন্যাসে নিয়ে আসেন ('লাল মেঘ'- বুদ্ধদেব বসু)। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বাংলা উপন্যাসের ধারায় বুদ্ধদেব বসু সচেতন ভাবে চেতনা প্রবাহকে প্রয়োগ করে যে পথ দেখিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ('অত:পীলা') ও গোপাল হালদার ('ত্রিদিবা') সেই পথেই উপন্যাস রচনা করেছেন। মহাযুদ্ধোত্তর কালপর্বে ইংরাজি সাহিত্যে শোনা গিয়েছিল অবক্ষয়, হতাসার সুর, ফ্রয়েডিয় চিন্তা-i ¡he¡l কথা। এলিয়েট-Hl "*The wasteland*' - বা লরেন্সের '*The sons and lovers*' প্রভৃতি গ্রন্থে এই নিঃসঙ্গতা ও যৌণচেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।। 'কল্লোলে'র লেখকগণ মূলত এঁদের রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সমসময়ে বাংলাদেশের পটভূমিতে এই সব বিষয়কেই সাহিত্য নিয়ে আসেন। বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসুর N̊of-কবিতা, অচিন্ত্য কুমার বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে এই বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

'কল্লোলে'র লেখকদের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে ব্যাপক মিল লক্ষ্য করা যায়, বা এই লেখকেরা যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ যুদ্ধোত্তর কালপর্বে মানুষের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন, সামাজিক অবস্থা, এবং সর্বোপরি দৃষ্টিভঙ্গির যোগ। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ মহাযুদ্ধোত্তর কালের শোষণ-h'e¡, বোহেমিয়ান জীবন, মানুষের নি:সঙ্গতা, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়কে সাহিত্যের প্রধান বিষয় করেছেন-- k¡ প্রধান বিষয় হয়েছে 'কল্লোলে'র লেখকদের রচনার মধ্যেও। পুরোনো প্রথাকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করে সাহিত্যের মধ্যে এই সব বিষয়বস্তুকে প্রধান্য দিয়ে তাকে আরও 'বাস্তব' করে তুলতে চেয়েছিলেন।

'কল্লোলে'র লেখকেরা যে 'নতুনত্ব' , 'বাস্তবতা' বাংলা সাহিত্যে আনতে চেয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ রবীন্দ্রনাথ। কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের সময় (১৯২৩) রবীন্দ্রনাথ যদিও তখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে

পৌঁছেছেন, তবু বাংলা সাহিত্যের আকাশে তিনি তখনও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ। সৃষ্টির নব নব বৈচিত্রে সাহিত্যের ভান্ডার পূর্ণ করে চলেছেন তিনি। একদিকে আন্তর্জাতিক সন্মান, আন্যদিকে সাহিত্য সৃষ্টির বৈচিত্র্য-- সব দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যের আকাশে মধ্য গগনে। প্রাক-কল্লোল পর্বের লেখকেরা রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ পাশ-কাটিয়ে যাননি, বা তাঁরা তাঁকে 'প্রাচীন পন্থী' বলতে রাজি ছিলেন না। আর রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন' ছিলেনও না। রবীন্দ্রজীবনের অর্ধেকটা কেটেছে উনিশ শতকে। উনিশ শতকের নব-জাগরণের মূল্যবোধ HC G৫o কবি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। এই মূল্যবোধ হল মানুষের প্রতি আস্থা। কিন্তু তাঁর মন কোনো দিনই স্থবির ছিল না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর মনও এগিয়ে গেছে, সাহিত্য সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও প্রকাশ রীতির পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তিনি সবসময়েই বলেছেন মানবতাবাদের কথা। প্রাক-কল্লোল পর্বের লেMLNZ রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করেই সাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছিলেন। এমন কি এই মানবতাবাদী কবিকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে তাঁর 'ব্যক্তি' মানুষকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মৃণালের কথা' এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু 'কল্লোলে'র লেখকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ পুরোনো, অচল। বুদ্ধদেব বসুর Lb¡u- ''কল্লোলের সেই যুগটাই ছিল বিদ্রোহের। আর সেই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্যই ছিল রবীন্দ্রনাথ।''[18] a¡C তো রবীন্দ্রনাথকে শুনতে হল--''হেথা হতে যাও পুরাতন।''

'কল্লোলে'র লেখকদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মূল অভিযোগ ছিল যে, রবীন্দ্র সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব, h¡Ùh জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্যের তেমন কোনো যোগ নেই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন-- ''আমাদের দেশে যাঁহারা কথা-সাহিত্য লেখেন, তাঁহাদের দরিদ্র জীবনের অভিজ্ঞতা নাই। .....তাই সহানুভূতি সত্ত্বেও তাঁহারা দরিদ্র জীবনের করুণ মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকিতে পারেন না।''[19] রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচার করে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য, ''তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই। নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হলো তাঁর জীবন দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায় ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।''[20]

একদিকে 'অবাস্তব' বিষয়, অন্যদিকে ঈশ্বর ও মানুষে আস্থা-- রবীন্দ্র সাহিত্যের এই বিষয় সমকালীন যুদ্ধোত্তর 'কল্লোলে'র লেখকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে কাব্যে এর প্রথম প্রকাশ পেল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দু:খবাদ, মোহিতলাল মজুমদারের বলিষ্ঠ দেহাত্মবাদ ও নজরুলের যৌবনধর্মের জয়গানের মধ্য দিয়ে। অচিন্ত্য কুমার স্পষ্টতই ঘোষণা করলেন --

''সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ম আলো
kN-সুর্য ম্লান তার কাথে। মোর পথ আরো দূর।''[21]

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে 'আর দূরের' দিকে যাত্রা করার কথা ঘোষণা করলেন 'কল্লোলে'র লেখকেরা। তাঁরা সাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে একদিকে যেমন নিয়ে এলেন - নিচুতলা'র মানুষকে, অন্য দিকে c¡l âÉ-qa¡n¡-যৌনচেতনা, রোম্যান্টিক প্রেম। সব মিলিয়ে সাহিত্যে এমন সব বিষয়বস্তুকে নিয়ে এলেন--k¡ Ih¾c সাহিত্যে 'দূর্লভ'। অচিন্ত্য কুমার বলেছেন-- ''রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেIRm AfS¡a ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলেকায়।''[22] সেই জন্য রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে 'নবনব জন্ম সম্ভবনায়'য় সচেষ্ট হলেন 'কল্লোলে'র লেখকেরা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ‘কল্লোলে’র লেখকগণ রবীন্দ্র বিরোধী হলেও রবীন্দ্র সমকালেই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ‘কল্লোলগোষ্ঠী’র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। শরৎচন্দ্র ‘কল্লোলে’কোনোদিন লেখেন নি ঠিকই, কিন্তু ‘কল্লোলে’র পৃষ্টাতে শরৎচন্দ্র যতটা প্রাধান্য পেয়েছেন, আর কোনো লেখক তা পান নি। ‘কল্লোলে’র তৃতীয় বর্ষ (১৩৩২) থেকে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ‘শরৎচন্দ্র’ নামে শরৎচন্দ্রের জীবনী রচনা শুরু করেন। এছাড়া ‘শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ’ এবং ‘রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র’ নামে ‘কল্লোলে’ দুটি প্রবন্ধ fL¡¢na qu (°SÉù - ১৩৩৩)। অচিন্ত্য কুমার তাঁর ‘কল্লোলযুগ’ গ্রন্থের মধ্যে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সবসময়েই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মৃতিচারণ করেছেন। শরৎচন্দ্র ‘কল্লোলে’র অনেক আগেই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। "i¡la£', "kje¡', "i¡laho' fi¢a f¢œL¡u a¡l HL¡¢dL NÒf-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র কখনোই ‘কল্লোল গোষ্ঠী’র মতো রবীন্দ্র বিরোধী ছিলেন না, বরং বলা যেতে পারে, তিনি ছিলেন ‘ভারতী-গোষ্ঠী’র ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত। তিনি কখনোই প্রাচীন সংস্কার, সমাজকে অস্বীকার করেন নি। পল্লীসমাজকে স্বীকার করে, পুরোনো ধ্যান ধারণাকে মূল্য দিয়ে তিনি নতুনকে আনতে চেয়েছেন, মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন, পতিতাকে সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, ‘‘সমাজ জিনিসটাকে আমি জানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে।’’[23] a¡C a¡l NÒf-উপন্যাসের চরিত্রগুলি এত উজ্জ্বল। তারা কখনোই সমাজ-সংস্কারের চাপে অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কিরণময়ীকে তিনি পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রকে বিশেষ করে নারী চরিত্রকে তিনি গৌরবের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সমালোচকের মতে-- ""a¡q¡l f¡u pLm e¡l£ চরিত্রের ভিতর দিয়া মাতৃত্বের গৌরব।’’[24] তাই শরৎচন্দ্রকে ঠিক ‘কল্লোল গোষ্ঠীর’র পূর্বসুরী হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে না। নতুন কে তিনি নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু পুরোনোকে বর্জন করে নয়। ‘‘শরৎচন্দ্র যদিও প্রচলিত সমাজপ্রথার আত্মঘাতী মূঢ়তা ও অপচয়হীন বিকৃতি দেখাইয়াছেন, তথাপি তিনি বাঙালী জীবনবোধের শাশ্বত মূল্যের কোনো রূপান্তর করিতে চাহেন নাই।’’[25] ‘কল্লোলে’র লেখকেরা শরৎচন্দ্র থেকে অনেক খানি সরে এসেছিলেন। ‘‘দেশ ও কাল, যুগ ও জীবনের বহু বিচিত্র-0¡a-প্রতিঘাত তাঁদের শিল্প চেতনাকে গঠন করে ছিল নূতন ভাবে। কিন্তু তবু তাঁদের সেই সৃষ্টির বিচিত্র শস্য সম্ভাবের দু’একটি বীজ হয়তো শরৎচন্দ্র সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছিলেন ভাবী-দিনের জন্য।’’[26] এই প্রসঙ্গে কাজী আব্দুল ওদুদ্ বলেছেন, ‘‘যাকে সাহিত্যে বাস্তববাদ বা Realism hm¡ qu a¡ a¡l ¢hi¢oL¡ Bl BLoZ cC-ই নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠল শরৎচন্দ্রের আর্বিভাবের অল্পকাল পরেই। বাঙলা সাহিত্যে বাস্তব বাদের গুরু শরৎচন্দ্র -- Ha hs pÇj¡e h¡ দুর্ণাম যে সত্যই তাঁর প্রাপ্য নয়, এর সত্যকার গুরু বরং কাল - এ বিষয়ে আজ আমরা নিসন্দেহ।’’[27] Bl এখানেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ‘কল্লোলে’র লেখকদের সম্পর্ক এবং পার্থক্য।

কিন্তু ইচ্ছাই হউক আর অনিচ্ছায় হউক শরৎচন্দ্র ‘কল্লোলে’র লেখকদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। f¡L-কল্লোল পর্বের লেখক হলেও শরৎচন্দ্র প্রকাশ্যে স্বাগত জানালেন নব যুগের কথা সাহিত্যিকদের। ‘কল্লোলে’র লেখকদের রবীন্দ্র বিরোধিতা যখন চরম আকার ধারণ করল, তখন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মাত্রা নির্ণয় করলেন। ৪ই ও ৭ই চৈত্র ১৩৪৪ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিচিত্রাভবনে আধুনিL J A¢a B¢d¤eL সাহিত্যিকদের বিবাদের মিমাংসা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি ‘কল্লোলে’র লেখকদের বাস্তবতাকে ব্যঙ্গ করে বললেন যে সাহিত্য শিল্পের বিচারে রূপসৃষ্টিই আসল। তাঁর মতে- ‘‘সাহিত্যের যুগ বলতে কি বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খণিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে? এই রকমের কোনো একটি ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টিকরা যায় একথা মানতে পারব না। ......খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন, তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই

করেন, সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্ন রকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খণিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তগর্ত না হয়। কোনো একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনায় ভঙ্গী বা সৃষ্টি ছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয়নি সেই জন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হোলো সেও অসঙ্গত। পাগলামির মতো অপূর্ব আর কিছু নেই -- কিন্তু তাকেও ও রিজিন্যালিটি বলে গ্রহণ করতে পারিনে।''[28]
রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বললেন , ''নবযুগের কোনো সাহিত্য নায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করেছেন।''[29]
রবীন্দ্রনাথের এই কথার পর শরৎচন্দ্র 'কল্লোলগোষ্ঠী'র সমর্থনে বললেন-- ''দেশের সাহিত্য কি নবীন সাহিত্যিকের হাতে সত্য সত্যই নীচের দিকে নেমে চলেছে ? এ যদি সত্যি হয়, আমার নিজের অপরাধ ও কম euz --- k¡l¡ ¢hNa, k¡l¡ pM-দুঃখের বাহিরে, এ দুনিয়ার দেনা-পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তরে গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা তাঁদেরই চিন্তা, তাঁদের নির্দিষ্ট পথের সঙ্কেতই কি এত বড়? আর যাঁরা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জরিত তাঁদের আশা, তাঁদের কামনা কি কিছুই নয় ? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথ রোধ করে থাকবে? তরুণ সাহিত্য তো শুধু এই Lb¡VLC বলতে চায়! তাদের চিন্তা, i¡h BS Ap‰a, এমনকি অন্যায় বলেও ঠেকতে পারে, কিন্তুতারা না বললে বলবে কে ?''[30]

এর পর রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্মে'র বিরোধিতা করে শরৎচন্দ্র স্পষ্টতই 'কল্লোলে'র লেখকদের সমর্থনে বললেন-- ""paÉC ¢L BdꜝeL h¡‰¡m¡ p¡¢qaÉ l¡Ù¡l dm¡ f¡L L¢lu¡ a¡mu¡ fl¢f রের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকেই সাহিত্য-সাধনা জ্ঞান করিতেছে? হয়ত কোথাও ভুল হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের প্রতি এত বড় দন্ডই কি সুবিচার হইয়াছে ?''[31] সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের অভিযোগ হল যে, কবি নিজে আধুনিক সাহিত্য না পড়ে শুধু ভক্তদের মুখের কথা শুনে এই সাহিত্য সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করেছেন-- ''ভক্তের মুখের ধার কথা অভিমতটাকেই অসংশয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাতেই কি ন্যায়ের jk¡c¡ r৯ qu e¡ ?''[32] এই ভাবেই প্রাক্-কল্লোল পর্বের লেখক হলেও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে 'কল্লোলে'র লেখকদের যোগ স্থাপিত হয়েছিল। তিনি সাহিত্য 'নতুন যুগ' আনার জন্য বারবার 'কল্লোল'দের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন, যা শরৎচন্দ্র অন্য- কোনো সাহিত্য গোষ্ঠীর সমর্থনে করেন নি।

f¡L-কল্লোল বাংলা পত্রিকা থেকে এই সব বিভিন্ন কারণে কল্লোল পত্রিকার লেখকেরা পৃথক হয়েছিলেন। এই পার্থক্য যে দৃষ্টিভঙ্গির তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। জীবনকে তারা দেখেছেন নতুন দিক থেকে, নতুন দৃষ্টি ভঙ্গিতে। 'কল্লোলে'র মূল সুরই ছিল বিদ্রোহের, পুরোনকে অস্বীকার করে নতুনকে গ্রহণ করার প্রবণতায়। অচিন্ত্য কুমারের কথায় -- ''যেমনটি আছে, ঠিক তেমনটি আছে, এর প্রচন্ড অস্বীকৃতি।''[33] আর সেই কারণেই সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে নিয়ে এলেন এমন সব বিষয়বস্ত্ত যা প্রচল নির্ভর eu, k¡ f¡L-কল্লোল বাংলা পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায় না। এঁদের কথা-সাহিত্যে বিষয়ের প্রসার ও বৈচিত্র্য এল, রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে এঁরা সাহিত্যের মধ্যে নিয়ে এলেন যুদ্ধোত্তর কালের সংকট কে। এল নাগরিক জীবনের হতাশা, রাজনৈতিক জীবন (গোকুলচন্দ্রের 'পথিক', 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল'), ফ্রয়েডিয় যৌণ-মণস্তত্ত্বের অসংকোচ প্রকাশ (বুদ্ধদেব hpl - 'রজনী হল উতলা', 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পঞ্চশর'), নাগরিক বস্তি জীবনের কাহিনী, অবহেলিত মানুষ, (যুবনাশ্বের 'পটল ডাঙ্গার পাঁচালী') মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর প্রয়াস (শৈলজানন্দের 'ধ্বংস পথের যাত্রী HI¡'), N¡jÉZ S¢he, Lum¡ L¢ঠ, শ্রমিক জীবনের কথা, অসংকোচ বলিষ্ঠ প্রাণের রূপ, আদিম প্রবৃত্তি (শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি'), পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ, অনুসরণ ও অনুবাদ ('বেদে', 'যাযাবর',

'মীণকেতন'), ভবঘুরে জীবনের কথা ('বেদে'), হতাশা, ব্যর্থতা, নেতিবাদী ধ্যান ধারণা (জগদীশ গুপ্তের গল্প), রোম্যান্টিক প্রেমের চিত্রাঙ্কণ (মনীন্দ্রলালের 'রমলা') বিধবার সমস্যা (হরিপদ বসুর 'ঘাটের পথে'), পতিতার প্রেম ও পতিতাকে সাহিত্যে বিশেষভাবে মর্যাদা দেওয়া (প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে) -- fi৻a ৻h৻Qœ বিষয়বস্তু। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, 'ভারতী গোষ্ঠী'র কথাসাহিত্যিক গণও এই সমস্ত বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক ৻LRই তাঁদের কথা-সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রকাশ ভঙ্গি 'কল্লোল গোষ্ঠী'র মতো এত তীব্র ছিল না, বা পুরোনো প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জনও করেন নি। তাঁরা ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা রেখেই নতুন বিষয়কে সাহিত্যের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। 'কল্লোল' পরবর্তী একজন বিশিষ্ট লেখক 'কল্লোলে'র লেখকদের বাস্তবতাকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন -- 'বস্তি জীবন এসেছে, কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি।''[34] 'বস্তি জীবনের বাস্তবতা' এসেছে কিনা সে বিষয়ে বির্তক থাকতে পারে, কিন্তু বস্তিজীবনের সাহিত্যে প্রথম নিয়ে এসেছিলেন এঁরাই -- এবিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

আগেই বলা হয়েছে মহাযুদ্ধোত্তর কালের পটভূমিতে কল্লোল পত্রিকার প্রকাশ। স্বাভাবিক ভাবেই নতুন দেশ-কাল, নতুন যুগ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন 'কল্লোলের' লেখকেরা। এঁদের সাহিত্যে পুরোনো উপকরণ আশা করাও বৃথা। প্রাক্-কল্লোল পর্বের লেখকেরা যে কালে, যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন 'কল্লোলে'র কালে তা আর নেই। পারিপার্শ্বিক জীবনের সঙ্গে আর্থ-p¡j¡৻SL Ap¡j”pÉ ও রাজনৈতিক পটভূমিই যে প্রাক্-কল্লোল পত্রিকা থেকে কল্লোল পত্রিকার লেখকের স্বাতন্ত্র্যের মূল কারণ -- a¡ আগেই বলা হয়েছে। এঁদের উপন্যাসেও গল্পের মধ্যে এটাই পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী পর্বে আমরা 'কল্লোলে' fL¡৻na Eপন্যাস ও গল্পের মধ্যে এই লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতা গুলি কোথায়, কিভাবে ও কতটা পরিমাণে চিত্রিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনার সচেষ্ট হব।

উল্লেখপঞ্জী :

১. 'কল্লোল' (১৩৩০), 'কালি-Lmj' (1333), "fN৻a' (1334) -- fi৻a f৻œL¡ ...৻m Ih৻c-পরবর্তী কালে একসূত্রে বাঁধা ছিল। এদের ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'উত্তরা', 'ধূপছায়া', 'সংহতি' প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকা। এই প্রত্রিকাগুলির পুরোধা ছিল 'কল্লোল'। কল্লোল পত্রিকার লেখকদের কেউ কেউ এই সব পত্রিকায় লিখতেন। এঁদের প্রত্যেকের লেখার মধ্যি 'কল্লোলের' সুরই শোনা গিয়েছিল। তাই এই সব পত্রিকা ও তার লেখকদের একত্রে 'কল্লোল গোষ্ঠী' বলা হয়। তবে বর্তমানে আমাদের আলোচ্য কল্লোল পত্রিকা ও তার কথাসাহিত্য।

২. নৃপেন্দ্র ভ–¡Q¡k, *h¡wm¡l Ab°e৻aL C৻aq¡p,* 2u pwú¡lZ, 1390, f- 131-132z

৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস,* "৻àa৻u fh', 2u pwú¡lZ, 1398, f -143-144z

4. A৻Q¿¯L¥j¡l সেনগুপ্ত, Se - 1903z
প্রেমেন্দ্র মিত্র, 1905z
বুদ্ধদেব বসু, 1908z

5. *'যোগাযোগ'* -- উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি।

৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "*B ধুনিক ও অতি আধুনিক সাহিত্যে জীবন-বোধের তারতম্য'* , সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সংগমে, ১ম pw - 1369, f - 307-308z

7. *কল্লোল যুN*, 7j pwú¡lZ, 1395z f - 135z

৮. 'বক্তব্য', 'নূতন ও পুরাতন', ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, dS৻V fp¡c lQe¡hm£, 1j pwú¡lZ, 1987, f - 182z

৯. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, "*দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* 2u pwú¡lZ, 1986, f - 187z

১০. জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কল্লোলের কা*m, 2u pwú¡lZ, 1987, f - 137z

১১. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, *কল্লোলের কাল,* 2u pwú¡lZ, 1987, f - 141z

১২. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস,* 1j pwú¡lZz

13. pSe£L¡¿ c¡p, *Ba£Øj¢a*, AMä pw, 1384, f - 88-89z
14. ‘বেদে’ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, *A¢Q¿É N¿¡hm£* 1j Mä, 1974, f - 661z
15. *কল্লোল যুগ,* 7j pwúlZ, 1395, f - 61z
১৬. গোপিকানাথ রায়চৌdl£, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য,* 2u pwúlZ, 1986, f - 206z
17. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* 4b Mä, 4b pwúlZ, f - 344z
18. "lh£¾ce¡b J Ešl p¡dL', *p¡¢qa£QQ¡*, 1j pwúlZ, 1361, f - 147z
19. "h¡‰¡m¡ Lb¡l A¢iS¡a£', *h‰h¡Z£*, Bo¡t - 1322, f - 542z
20. "lh£¾ce¡b J Ešl p¡dL', *p¡¢qa£QQ¡*, 1j pwúlZ, 1361, f - 147z
21. "B¢h¡L¡l' L¢ha¡z
22. *কল্লোল যুগ,* 7j pwúlZ, 1395, f - 47z
২৩. ‘সাহিত্যে আর্ট ও দূনীতি’, *nlv p¡¢qa£ pjN*, 1392 (Be¾c f¡h¢mp¡p), f - 1980z
24. n¢n i oZ c¡n...ç, *বাংলা সাহিত্যের নব যুগ,* 7j pw, 1383, f - 265z
২৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "*BdeL* J A¢a Bd¢eক সাহিত্যে জীবনবোধের তারতম্য’, *p¡¢qa£ J pwú¢al-তীর্থসংগমে,* 1j pwúlZ - 1369, f - 304z
২৬. গোপিকানাথ রায়চোধুরী, *cC ¢hnkদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* 2u pwúlZ, 1986, f - 173-174z
27. *nlvQ¾c J a¡lfl*, 1j pwúlZ, f - 118z
28. "p¡¢qa£ l¢f', *সাহিত্যের পথে,* 1388, f - 203-204z
29. l f - 201z
৩০. ‘সাহিত্যে আর্ট ও দূনীর্তি’, *nlv p¡¢qa£ pjN*, 1392 (Be¾c f¡h¢mn¡n), f - 1979-1980z
31. *সাহিত্যের রীতি ও নীতি,* l - l f - 1990z
32. *সাহিত্যের রীতি ও নীতি,* l - l f - 1990z
33. *কল্লোল যুগ* - 7j pwúlZ -- 1395, f - 47z
৩৪. মাণিক বন্দ্যোপাধায়, ‘সাহিত্যকরার আগে’ *লেখকের কথা,* 1981, f - 24z